بنغالي
BENGALI

তাওহীদের ডাক

التوحيد أولا يا دعاة الإسلام

মূলঃ
মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানী (রঃ)

অনুবাদঃ
আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل
JUBAIL DA'WAH & GUIDANCE CENTER
هاتف: ٣٦٢٥٥٠٠ ٠٣ فاكس: ٣٦٢٦٦٠٠ ٠٣ ص.ب. ١٥٨٠ الرمز البريدي: ٣١٩٥١
الموقع الرسمي: jubaildawah.org البريد الإلكتروني: info@jubaildawah.org

তাওহীদের ডাক

মূলঃ

মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানী (রঃ)

অনুবাদঃ

আবদুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম, এম, ফাস্ট ক্লাশ

التوحيد أولا يا دعاة الإسلام

تأليف محمد ناصر الدين الألباني

ترجمة:

عبد الله شاهد

সূচীপত্র

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকগণ ইসলামের মৌল বাণী "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সঠিক অর্থ সম্পর্কে অবগত নয়। এই পবিত্র বাণীর মর্মার্থ সম্পর্কে অবগত নয় বলেই তারা তাদের জীবণে কালেমার সঠিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তারা কালেমা তায়্যেবার মর্মার্থের সরাসরি বিরোধী কাজ তথা বড় বড় শির্কেও লিপ্ত হচ্ছে। মাজারে সেজদা করাসহ শির্কের এমন কোন প্রকার নেই যাতে এক শ্রেণীর নামধারী মুসলিম লিপ্ত হচ্ছেনা। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে মুসলিম উম্মার এক শ্রেণীর আলেমদেরও তাওহীদ ও শির্ক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই। যার ফলে তারা জাতিকে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি আহবান করতে সক্ষম নয়।

কিন্তু তাদের মধ্যে হতে ইসলামের ভালবাসা উঠে যায়নি। তারা চায় জাতিকে পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে ও মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের ন্যায় একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করতে। অথচ এ সমস্ত ইসলামী কাফেলার নেতা-কর্মীদের মধ্যে তাওহীদের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে তারা জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারছেনা। নবী (সাঃ) যেভাবে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, যে পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেছেন, সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। ফলে মুসলিম যুব সমাজ আজ হাতাশাগ্রস্ত। তারা তাওহীদের শিক্ষা অর্জন না করে এবং তাদের ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবণে ইসলামের মূল শিক্ষা বাস্তবায়ন না করেই রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে বিজয়ী দেখতে চায় এবং যে কোনভাবে রাষ্ট্রীয় মতা দখল করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অথচ এটি নবী-রাসূলদের পদ্ধতি

নয়। সকল নবীই সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের সকল ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করতে আজীবণ সংগ্রাম করেছেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)ও একই পথ অনুসরণ করেছেন। নবুওয়াতের তেরটি বছর তিনি মক্কা নগরীতে নানা বাধা-বিগ্নতা ও নির্যাতন সহ্য করে তাওহীদে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমানে ইসলামী দল ও সংগঠনগুলোর কর্ম-কান্ডের প্রতি গভীরভাকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে তারা তাওহীদের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেনা। ক্ষমতায় যাওয়ার জনই তাদের অধিকাংশ মেধা ও শ্রম ব্যয় হচ্ছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মার আলেম ও দ্বীনী সংগঠনের কর্মীদের করণীয় সম্পর্কে যুগ শ্রেষ্ঠ ভিজ্ঞ আলেম আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানী (রঃ) যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, অত্র পুস্তিকায় আমরা তা পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরছি। পুস্তিকাটি পড়ে পাঠক সমাজ উপকৃত সংশোধন হয় তবেই আমার শ্রম সার্থ হয়েছে বলে মনে করব। যাদের সহযোগিতায় বইটি প্রকাশিত হল আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আমীন॥

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
পি.ও. বক্সঃ ১৫৮০
আল-জুবাইল- ৩১৯৫১, সৌদি আরব
মোবাইলঃ- ০৫০৩০৭৬৩৯০
বাংলাদেশঃ- ০১৭৩২৩২২১৫৯।

তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের দিক নির্দেশনা চেয়ে ইমাম আলবানীর নিকট তিনটি প্রশ্ন

সম্মানিত শায়খ! আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, বিভিন্ন কারণে বর্তমানে মুসলিম জাতির ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তারা সঠিক আকীদাহ সম্পর্কে অজ্ঞ, দলে দলে বিভক্ত। অধিকাংশ অঞ্চলে তারা সালাফী আকীদাহ ও আমলের দাওয়াতের ক্ষেত্রে চরম অবহেলা করে চলছে। অথচ সঠিক আকীদাহ ও আমলের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি সংশোধিত হয়েছিল। নিসন্দেহে মুসলিম জাতির এই বেদনাদায়ক অবস্থা একদল নিষ্ঠাবান লোকদের মাঝে চেতনার সৃষ্টি করেছে এবং জাতিকে বর্তমান বেদনাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের মাঝে প্রবল আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু জাতিকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাদের মাঝে প্রচুর মতবিরোধ রয়েছে। এই মতবিরোধ বিভিন্ন ইসলামী দল ও আন্দোলনের নিকট তাদের আকীদাহ ও আমল গ্রহণের উৎস্যের বিভিন্নতার কারণেই সৃষ্ট হয়েছে। অথচ এ সমস্ত ইসলামী দল বছরের পর বছর ধরে জাতিকে সংশোধন ও উদ্ধারের দাবী করে আসছে। তাদের এই প্রচেষ্টা সফল হওয়া তো দূরের কথা; বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত কর্ম পদ্ধতি, আকীদাহ ও সুন্নাত বিরোধী আকীদাহ ও কর্ম পদ্ধতির কারণে মুসলিম জাতির উপর বড় বড় মুসিবত, ধ্বংস ও ফিতনা নেমে এসেছে। যার ফলাফল স্বরূপ মুসলমানগণ বিশেষ করে যুবক সমাজ বর্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধারের পদ্ধতি নিয়ে চরম হতাশায় ভোগছে।

নবী মুহাম্মদ (সাঃ)এর সুন্নাত ও সাহাবী এবং তাবেয়ীদের পথের অনুসারী একজন সচেতন মুসলিম অবশ্যই অনুভব করে যে, এই বেদনাদায়ক অবস্থা থেকে মুসলিম মিল্লাতকে উদ্ধার, সংশোধন অথবা

সংশোধনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তার উপর মহান আমানত সমর্পিত রয়েছে।

☞ সম্মানিত শায়খ! যে সমস্ত আন্দোলন ও দলের কর্মীগণ জাতিকে উদ্ধারের কাজে আত্মনিয়োগ করতে চাচ্ছে, তাদেরকে আপনি কি উপদেশ দিচ্ছেন?

☞ জাতিকে এই করুণ পরিস্থিতি হতে উদ্ধারের ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিতে সফলজনক কর্মপদ্ধতি কি?

☞ মুসলিম ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে কিভাবে আল্লাহর দরবারে আপন জিম্মাদারী ও দায়িত্ব হতে রেহাই পেতে পারে?

যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুহাদ্দিছ আল্লামা মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন আলবানী (রঃ) উপরোক্ত জিজ্ঞাসার যে সুস্পষ্ট জবাব প্রদান করেছেন দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী হিসাবে দর্শনার্থী যুবক ও ছাত্র সমাজের কাছে তা উপস্থাপন করছিঃ

নবী ও রাসূলদের মানহাজ (কর্ম পদ্ধতি) ছিল সর্বপ্রথম তাওহীদের প্রতি আহবান করাঃ

উল্লেখিত প্রশ্নে মুসলিম উম্মার যে শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে, তার উত্তরে আমি বলব যে, এই বেদনায়ক অবস্থা রাসূল (সাঃ)এর প্রেরণের সময়কালের আইয়্যামে জাহেলীয়াতের আরবদের অবস্থার চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট নয়। কারণ আমাদের মাঝে রয়েছে পরিপূর্ণ রেসালাত, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দল, যারা মানুষকে সঠিক পথের দিকে এবং মানুষকে সঠিক ইসলামী আকীদাহ, আমল, আখলাক ও জীবন পদ্ধতির দিকে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমানকালের অনেক মুসলিম জনসমাজের অবস্থা জাহেলী যুগের মুশরিক আরবদের অবস্থার মতই। বর্তমানে মুসলমানদের

বিরাট এক অংশের মাঝে বিভিন্ন প্রকার শির্কের ছড়াছড়ি। কবর পূজা, মাজার পূজা, কবরে সেজদা করা, অলী-আওলীয়াদের উসীলা দেয়া, গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ করা, পীর-ফকীরের নামে পশু কুরবানী করা, মানত করা ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে মক্কার মুশরেকদের চেয়ে বর্তমানকালের মুসলমানদের শির্ক অধিক ভয়াবহ। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সন্তান চাওয়া, সাহায্য চাওয়া, বিপদে-আপদে গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

এর উপর ভিত্তি করে আমি বলব যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, সেভাবেই শুরু করতে হবে। যেহেতু উভয় সমাজের অবস্থা একই, তাই চিকিৎসা একই হবে। যেভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাহেলী সমাজকে দাওয়াতের মাধ্যমে শির্কের কদর্যতা থেকে মুক্ত করেছিলেন, আজকের সকল আলেম ও দাঈদের কর্তব্য হল তারা (لاإلـه إلا الله) এর সঠিক অর্থ অনুধাবন করে তা মানুষকে বুঝাতে সচেষ্ট হবে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে পদ্ধতিতে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তারাও তাই করবে। আমার এই কথার অর্থ খুবই সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلَ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيْراً ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আহজাবঃ ২১)

আমাদের বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের এবং সকল যুগের মুসলমানদের সকল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। একথার অর্থ এই যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যার মাধ্যমে দাওয়াত শুরু করেছেন, আমরাও তা দিয়ে আরম্ভ করব। তা এই যে আমরা প্রথমে মুসলমানদের ভ্রান্ত আকীদাহ সংশোধনের কাজে আত্মনিয়োগ করব। অতঃপর আমল সংশোধন। তারপর তাদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা। আমি এই ধারাবাহিকতার মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়গুলোর একটি হতে অন্যটিকে পৃথক করতে চাইনি। আমার কথার অর্থ হল আকীদা সংশোধনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে। মুসলমানদের আকীদাহ সংশোধনের ক্ষেত্রে দাঈ ও আলেমদের কথা আসবে সবার পূর্বে। কারণ আলেমদের ভিতরে কুরআন-সুন্নার সঠিক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তা সত্বেও তারা ইসলামের প্রচারক ও খাদেম হিসাবে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। আলেমদের ইলম শুণ্য অবস্থার ক্ষেত্রে জ্ঞানীদের সুপ্রসিদ্ধ আরবী প্রবাদ বাক্যটি প্রজোয্য। فاقد الشئ لا يعطيه অর্থাৎ যার কাছে যে জিনিষ নেই সে তা অপরকে দিবে কিভাবে? আমরা জানি, মুসলিম উম্মার মাঝে লক্ষ লক্ষ ইসলাম প্রচারক রয়েছেন। মানুষের কাছে তারা তাবলীগ জামাতের মুরব্বী বা আলেম হিসাবে পরিচিত। তাদের অধিকাংশই দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسَ لاَ يَعْلَمُوْنَ﴾

“কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ”। তাবলীগীদের দাওয়াতের তরীকা হল, তারা প্রথম মূলনীতির (আকীদাহ) প্রতি গুরুত্ব দেয়া থেকে

সম্পূর্ণ বিমুখ। অথচ তার মাধ্যমেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সংশোধনের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। শুধু আমাদের নবী নন; সমস্ত নবী-রাসূলগণই তাওহীদের মাধ্যমে তাদের দাওয়াতী মিশন আরম্ভ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ﴾

"আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্যে আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহলঃ ৩৬) তাবলীগীরা ইসলামের এই প্রথম রুকন ও মূলনীতির উপর মোটেই গুরুত্ব প্রদান করেনা। এই মূলনীতির দিকে পৃথিবীবাসীর নিকট প্রেরিত প্রথম রাসূল নূহ (আঃ) প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। আর একথা সকলের জানা যে, আমাদের দ্বীনের ন্যায় পূর্ববর্তী শরীয়ত সমূহের মধ্যে ইবাদত ও বৈষয়িক জীবনের আহকামগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ছিলনা। কেননা আমাদের দ্বীন সর্বশেষ দ্বীন। এ দ্বীন পূর্বের সকল দ্বীনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছে। অথচ নূহ (আঃ) তাঁর জাতির মাঝে নয় শত পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অবস্থান করে বেশীরভাগ সময় জাতির লোকদেরকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর জাতির লোকেরা তাঁর দাওয়াত কবূল করেনাই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَ قَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لاَ سُوَاعًا وَ لاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَ نَسْرًا﴾

"এবং তারা বলেছিল, তোমরা কখনও পরিত্যাগ করোনা তোমাদের দেবদেবী, পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সু'আ, ইয়াগুস, ইয়াউক এবং

নাসরকে”। (সূরা নূহঃ ২৩) এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে, সঠিক ইসলামের প্রচারকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল সদাসর্বদা তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া। আল্লাহ তা’আলার বাণীঃ

﴿فَاعْلَمْ اَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ﴾

“আপনি জেনে নিন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই”। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর তরীকা এটাই ছিল যে প্রথমে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া। এ কথাটি বেশী বুঝিয়ে বলার দরকার নাই। মক্কী জীবনে রাসূল (সাঃ) সমস্ত কাজ-কর্ম অধিকাংশ সময়ই তাঁর গোত্রের লোকদেরকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

তিনি কাউকে শিক্ষা দেয়ার সময়ও তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়ার শিক্ষা দিতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুয়ায (রাঃ)কে ইয়ামানের গভর্ণর ও শাসক নির্বাচন করে পাঠালেন তখন তাকে বলে দিলেন যে,

فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“তুমি তাদেরকে সর্বপ্রথম এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। তারা যদি তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তুমি তাদেরকে বল যে, আল্লাহ তা’আলা

দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। যদি তারা এটিও মেনে নেয়, তখন তুমি তাদেরকে বল যে, আল্লাহ তোমাদের সম্পদের উপর যাকাত ফরজ করেছেন। ধনীদের নিকট থেকে তা আদায় করা হবে এবং দরীদ্রদের মাঝে তা বিতরণ করা হবে। একথা যখন তারা মেনে নিবে তখন যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বেছে বেছে ভাল সম্পদগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। আর বিশেষ করে অত্যাচারিত ব্যক্তির বদ দু'আ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ অত্যাচারিতের বদ দু'আ এবং আল্লাহর মাঝে কোন আবরণ নেই।[১] হাদীছটি সকলের কাছে পরিচিত।

সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন, তাঁর সাহাবীদেরকেও তা দিয়ে আরম্ভ করার আদেশ দিয়েছেন। আর তা হল তাওহীদের মাধ্যমে শুরু করা। কোন সন্দেহ নেই যে, জাহেলী যুগের মুশরিক আরব ও বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলমানদের মধ্যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আরবের মুশরেকরা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ বুঝত। কিন্তু মুখে তা উচ্চারণ করতনা। এই জন্যই তাদেরকে মুখে এই বাক্যটি উচ্চারণ করার দাওয়াত দিয়েছেন। বর্তমান কালের সকল মাযহাবের ও ফির্কার অনেক মুসলমানই মুখে কালেমাটি উচ্চারণ করে কিন্তু এর অর্থ বুঝেনা। তাই তাদেরকে তা মুখে উচ্চারণের দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারা এই পবিত্র বাক্যটির অর্থ বুঝার প্রতি খুবই মুখাপেক্ষী। প্রথম যুগের আরবগণ এই

---

[1] - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্ যাকাত।

পার্থক্যটি ভাল করেই বুঝত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখণ তাদেরকে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার দিকে আহবান জানাত, তখন তারা অহংকার করত। কুরআনে তাদের এই অহংকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা কেন অহংকার করত? কারণ তারা এই বাক্যটির গভীর মর্মকথা অনুধাবন করেছিল। তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এই কথা উচ্চারণ করলে আল্লাহর সাথে অন্য কোন অংশীদার নির্ধারণ করা চলবেনা, চলবেনা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত। অথচ তারা দীর্ঘদিন থেকে আল্লাহর ইবাদতের সাথে শরীক করে আসছে, গাইরুল্লাহকে আহবান করে আসছে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে আসছে। একই সাথে তারা গাইরুল্লাহর জন্য মানতি পেশ, গাইরুল্লাহর উসীলা দেয়া, গাইরুল্লাহর জন্য পশু যবাই করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে যাওয়া সহ বিভিন্ন প্রকার শির্কে লিপ্ত ছিল।

এই সমস্ত বহুল প্রচলিত শির্কে লিপ্ত থাকার সাথে সাথে তারা এটাও জানত যে, এই পবিত্র বাক্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর দাবী হল তাদের সমস্ত শির্কী উসীলা ও দেব-দেবীর সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন ঘোষণা করা। কারণ এই সমস্ত বাতিল মাবূদদের সাথে সম্পর্ক রাখা "লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ" এর অর্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"এর অর্থ বুঝেনাঃ

বর্তমান কালের অধিকাংশ মুসলমান যারা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দেয় তারা ভালভাবে এর অর্থ বুঝেনা; বরং তারা অনেক সময় এর উল্টা অর্থ করে থাকে। আমি একটি উদাহরণ পেশ করে তা বুঝাতে চেষ্টা করব। জনৈক সূফী সাধক "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর

অর্থ ব্যাখ্যা করে একটি পুস্তিকা রচনা করলেন। তিনি (لا إلـــه إلا الله) এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ (لا رب إلا الله) অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। মক্কার মুশরিকরা এই অর্থ বিশ্বাস করত এবং এর উপরই তারা ছিল। কিন্তু এই ঈমান তাদের কোন উপকার করেনাই। মক্কার মুশরিকরা যে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করত তার প্রমাণ হল আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

“আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন এই আকাশ-যমিন কে সৃষ্টি করেছে তখন তারা অবশ্যই বলবেঃ ‘আল্লাহ’। (সূরা লুকমানঃ ২৫) মুশরিকরা বিশ্বাস করত যে, এই বিশ্ব জগতের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। সৃষ্টিতে তার কোন শরীক নেই। কিন্তু তারা তাঁর ইবাদতে অসংখ্য অংশীদার নির্ধারণ করত। তারা বিশ্বাস করত যে, রব তথা প্রতিপালক মাত্র একজন। তবে মাবূদ অগণিত। আল্লাহ তাদের একথার প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

“যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে তারা বলে আমরা এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা এই জন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্যিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে। (সূরা যুমারঃ ৩)

মুশরিকরা অবশ্যই জানতো যে, (لا إلـــه إلا الله) কথাটি উচ্চারণ করার অর্থই আল্লাহ ছাড়া যত বস্তুর ইবাদত করা হয় তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা। বর্তমান কালের অধিকাংশ মুসলমান এই পবিত্র বাক্যটির ব্যখ্যায় বলে আল্লাহ ছাড়া কোন রব বা

প্রতিপালক নেই। সুতরাং যে মুসলিম কেবলমাত্র এই বিশ্বাস করবে তার এবং মুশরিকের মধ্যে আকীদার ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। যদিও বাহ্যিকভাবে তার মধ্যে ইসলামের বৈশিষ্ট দেখা যায়। কেননা সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'পাঠ করে। এই বাক্যটি পাঠ করার কারণে সে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলামের প্রচারকদের (দাঈদের) উপর ওয়াজিব হল তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং যারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের কাছে এর সঠিক মর্ম তুলে ধরা। মুশরিকের ব্যাপারটা ভিন্ন। কেননা সে 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করে। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কোনভাবেই সে মুসলমান নয়। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান প্রকাশ্যে মুসলমান হিসাবে গণ্য। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যারা উহা উচ্চারণ করল, তারা আমার হাত থেকে তাদের জান-মালকে নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের কোন হক যদি তাদের উপর আবশ্যক হয় তবে অবশ্যই তাদের উপর তা কার্যকর হবে। আর তাদের অন্তরের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত রইল।[১]

এ জন্যই আমি মাঝে মাঝে একটি বাক্য উচ্চারণ করি। তা এই যে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' নামক পবিত্র বাক্যটির অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে বর্তমানে অনেক মুসলমানের অবস্থা জাহেলী যুগের অধিকাংশ মুশরিকদের অবস্থা থেকেও নিকৃষ্ট। কেননা আরবের মুশরিকরা এর

---

[1] -বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান।

অর্থ বুঝতে পারত। কিন্তু এর মর্মার্থের উপর ঈমান আনয়ন করতনা। আর মুসলমানেরা এই বাক্যটি মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু এর অর্থ বুঝেনা। মুখে উচ্চারণ করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। কিন্তু সঠিক অর্থে এর উপর ঈমান আনয়ন করেনাই। তারা কবরের উপাসনা করে, গাইরুল্লাহ এর নামে পশু যবাই করে, মৃত ব্যক্তিদের কাছে দু'আ করা সহ বিভিন্ন প্রকার শির্কে লিপ্ত হয়। এটি একটি প্রকৃত ও বাস্তব সত্য কথা। রাফেযী[1], সূফী ও বিভিন্ন তরীকাপন্থীগণ এই ধরণের শির্কে লিপ্ত। কবরের কাছে হজ্জ করতে যাওয়া, শির্কের আস্তানা স্বরূপ গম্বুজ তৈরী করে তার চার পার্শ্বে কাবা ঘরের তাওয়াফের ন্যায় তাওয়াফ করা, নেককার লোকদের কাছে বিপদাপদে আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং অলীদের নামে শপথ করা তাদের অন্যতম আকীদাহ।

এ জন্যই আমি বিশ্বাস করি যে, মুসলিম উম্মার দাঈদের কর্তব্য হল, এই পবিত্র বাক্যটির উপর গুরুত্ব প্রদান করবে এবং প্রথমে অতি সংক্ষেপে এর অর্থ বর্ণনা করবে। অতঃপর বিস্তারিতভাবে এই কালেমার দাবীগুলো বর্ণনা করবে। এই কালেমার দাবী হল সকল প্রকার ইবাদত একনিষ্ঠভাবে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা যখন মুশরিকদের বক্তব্য,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্যিধ্যে এনে দিবে" কুরআন মাযীদে উল্ল্যেখ করলেন তখন আল্লাহ

---

[1] -শিয়াদের একটি ফির্কার নাম রাফেযী।

ছাড়া অন্যের জন্যে ইবাদত করাকে পবিত্র বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর সাথে কুফরী হিসাবে সাব্যস্ত্য করেছেন।

এই জন্যই আমি আজ বলব যে, কালেমা তাইয়্যেবার অর্থ না বুঝে মসলমানদের বিভিন্ন দল গঠন করা এবং দল ভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ভিতরে কোন কল্যাণ নেই। এরকম দল গঠন করা দুনিয়াতে ও আখেরাতের কোথায়ও কোন উপকারে আসবেনা। আমরা জানি যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি অন্তর থেকে এই সাক্ষ্য প্রদান করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই, আল্লাহ তার শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। অন্য বর্ণনায় আছে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে"। যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে এই বাক্যটি পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের গ্যারান্টি রয়েছে। যদিও তা শাস্তি ভোগ করার পর হোক না কেন। এই বাক্যটির উপর সঠিকভাবে বিশ্বাসকারী যদিও বিভিন্ন কবীরা গুনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে জাহান্নামের আযাব ভোগ করবে, কিন্তু তার শেষ পরিণতি হবে জান্নাত। অপর পক্ষে জবানের মাধ্যমে যে ব্যক্তি এই বাক্যটি পাঠ করবে, অথচ তার অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি তার জন্য পরকালে এই বাক্যটি কোন উপকারে আসবেনা। তবে দুনিয়াতে এই বাক্যটি পাঠ করে মুসলমানদের হাত থেকে জীবন রক্ষা করতে পারবে। যদি মুসলমানদের হাতে শক্তি ও রাজত্ব থাকে। কিন্তু পরকালে কোন উপকারে আসবেনা। তবে এর পাঠক যদি অর্থ বুঝে এবং সঠিকভাবে তার অর্থের উপর ঈমান আনয়ন করে তাহলে তার উপকারে আসবে। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর বিষয় বস্তুর উপর ঈমান না এনে শুধুমাত্র অর্থ বুঝা যথেষ্ট নয়। এই বিষয়টি সম্পর্কে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই উদাসীন। এই বাক্যটির অর্থ বুঝলেই তাঁর উপর

ঈমান আনা হয়ে যায়নি। ঈমানদার হওয়ার জন্য দু'টি বিষয় এক সাথে বর্তমান থাকা জরুরী। কেননা অনেক ইহুদী-নাসারারা জানত যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নবুওয়াত ও রেসালাতে সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে একথাটি উল্লেখ করেছেনঃ

﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم﴾

"তারা তাঁকে আপন সন্তানদের মতই চিনে"। (সূরা বাকারাঃ ১৪৬) তাদের এজানা কোন উপকারে আসেনি। কেননা তারা নবী ও রাসূল হিসাবে সত্যায়ন করেনি এবং তার উপর ঈমান আনেনি। তাই বলছি ঈমান আনার পূর্বে যে বিষয়ের উপর ঈমান আনা হবে তার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কিন্তু এই জ্ঞানই যথেষ্ঠ নয়; বরং জ্ঞান ও ঈমান এবং আনুগত্য একই সাথে থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মযীদে বলেনঃ

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

"আপনি জেনে নিন যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই অতঃপর আপনার গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করুন"। (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯)

সুতরাং কোন মুসলিম যদি জবানের মাধ্যমে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তার উপর জরুরী হল প্রথমে সংক্ষেপে এর অর্থ জানা অতঃপর বিস্তারিতভাবে তা জানবে। যখন জানবে তখন সত্যায়ন করবে এবং ঈমান আনবে, তার ক্ষেত্রে একটু আগে উল্লেখিত হাদীছগুলো প্রযোজ্য। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণীঃ

﴿مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ﴾

"যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করবে, কোন না কোন দিন অবশ্যই বাক্যটি তার উপকারে আসবে"।[১] অর্থাৎ এই পবিত্র কালেমাটির অর্থ ও মর্ম বুঝে যদি পড়া হয়, তাহলে এই বাক্যটি তার পাঠকারীকে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়া থেকে রক্ষা করবে। এই কথাটি আমি বার বার বলি। যাতে মানুষের মগজে কথাটি ভালভাবে প্রবেশ করে। হয়ত কোন কোন লোক সৎ আমল করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এই বাক্যটির হক পূর্ণভাবে আদায় করতে ব্যর্থ হবে। কিন্তু শির্কে আকবারে তথা বড় শির্কে লিপ্ত হওয়া থেকে মুক্ত থাকবে এবং ঈমানের দাবী অনুপাতে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সকল প্রকার সৎ কাজে লিপ্ত হবে। এরকম লোক আল্লাহর ইচ্ছাধীন। পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে কিংবা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করার কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু এই পবিত্র বাক্যটির কারণে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করেন। এটিই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণীঃ

﴿مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ﴾

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, কোন না কোন দিন অবশ্যই বাক্যটি তার উপকারে আসবে"।

আর যে ব্যক্তি অর্থ না বুঝে বাক্যটি উচ্চারণ করল কিংবা অর্থ বুঝে উচ্চারণ করল কিন্তু অর্থের দাবীর উপর ঈমান আনয়ন করল না তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কোন উপকার করবেনা। তবে দুনিয়াতে সে যদি

---

[1] - তাবারানী তার মু'যামুল আওছাতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আলবানী (রঃ) সহীহ বলেছেন।

ইসলামী হুকূমতের অধীনে বসবাস করে থাকে তা হলে সে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু পরকালে আল্লাহর শাস্তি হতে রেহাই পাবেনা।

এ জন্যই যে সমস্ত সমাজ বা সংগঠণ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে সে সমস্ত সমাজে প্রথমে তাওহীদের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। যে সমস্ত ইসলামী দল আল্লাহর যমিনে দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টায় লিপ্ত তাদের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবেনা, যতক্ষণ না তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর গৃহীত মূলনীতির মাধ্যমে কাজ শুরু করবে। তা হলো প্রথমে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করার চেষ্টা করা।

আকীদার প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়ার অর্থ এই নয় যে, এবাদত, আচার-আচরণ এবং অন্যান্য চারিত্রিক গুণাগুণ সম্পর্কে অবহেলা করতে হবে; বরং আল্লাহ যেহেতু এই দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন তাই আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহবানকারীগণ প্রথমে তাওহীদের প্রতি বেশী গুরুত্ব প্রদান করে মানুষের কাছে ইসলামের সকল দিক তুলে ধরবে।

আমার কথার সার সংক্ষেপ হল ইসলামের সত্যিকার প্রচারকগণ প্রথমে ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সঠিক আকীদা তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই- এর মর্মার্থের প্রতি বেশী গুরুত্ব দিবে। কিন্তু একেই যথেষ্ট মনে করবেনা। আল্লাহর ইবাদতের রূপ-রেখাও বুঝাতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মাখলুকের জন্য ইবাদতের কোন অংশ প্রদান করা যাবে না। বিষয়টি আরও পরিস্কার করে বলতে হবে। কারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনেক সময় যথেষ্ট হয়না।

অনেক তাওহীদপন্থী এমন মুসলমান রয়েছে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদতের কোন অংশ প্রদান করেনা অথচ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতে বর্ণিত অনেক সঠিক আকীদাহ হতে তাদের মস্তিস্ক সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা আকীদার সাথে সম্পৃক্ত আয়াত ও হাদীছসমূহ পাঠ করে কিন্তু তার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ তা আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমানের অন্তর্ভূক্ত। উদাহরণ স্বরূপ সমস্ত মাখুলেকর উপরে আল্লাহর সমুন্নত হওয়ার বিষয়টিকে ধরতে পারি। আমি অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি যে, আমার অনেক সালাফী ভাই কোন প্রকার ব্যাখ্যা বা ধরণ বর্ণনা ব্যতীত আমাদের মতই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ আরশের উপরে। কিন্তু সমকালীন বাতিল ফির্কার কোন লোক এসে যখন তাকে আকীদার বিষয়ে সন্দেহে ফেলে দেয় তখন সে বিভ্রান্তির ভিতর পড়ে যায়। এর কারণ হল কুরআন এবং সুন্নায় আকীদার মাসআলাগুলো যেভাবে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেভাবে সে সঠিক আকীদার শিক্ষা গ্রহণ করেনি। বর্তমান কালের কোন মু'তাযেলী লোক যখন বলে আল্লাহ তো বলেছেনঃ

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُمْ مَــنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

"তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। না তোমরা নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী"। (সূরা মুলকঃ ১৬-১৭) তাই তোমরা

বল আল্লাহ আকাশে। এতে করে তোমরা আল্লাহকে তাঁর একটি সৃষ্ট বস্তু আকাশের ভিতরে সীমাবদ্ধ করে দিলে। এভাবে মু'তাযেলীরা মানুষকে সন্দেহে ফেলে দেয়।

অনেক মানুষের কাছে সঠিক আকীদা এবং তার দাবীসমূহ সুস্পষ্ট নয়ঃ

উপরোক্ত কথার মাধ্যমে বলতে চাই যে, আশায়েরা, মাতুরিদীয়া এবং জাহমীয়া আকীদার বিশ্বাসীতো দূরের কথা, যারা সালাফী আকীদায় বিশ্বাসী তাদের অনেকের কাছেও সঠিক আকীদার দাবী সুস্পষ্ট নয়। মাসআলাটি তেমন সহজ নয়, যেমন মনে করে থাকেন কুরআন-সুন্নাহর দিকে আহবানকারী আমাদের কতক দাঈ ভাইগণ। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে, তা হল জাহেলী যামানার মুশরেক এবং বর্তমানকালের অধিকাংশ মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য। জাহেলী যামানার মুশরেকরা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর অর্থ বুঝার পরও তা মুখে উচ্চারণ করতে অস্বীকার করছে। আর বর্তমানকালের মুসলমানেরা তার সঠিক অর্থ না বুঝেই উচ্চারণ করছে। এই মূল পার্থক্যটিও বর্তমানে আল্লাহ আরশের উপরে বর্তমান থাকার মাসআলাতেও পাওয়া যাচ্ছে।

মাসআলাটি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা দরকার। আল্লাহর বাণী, "দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে" এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী,

﴿ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾

"তোমরা যমিনে যারা আছে তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর তাহলে আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন"।[1]

---

[1] - (সহীহ) আবু দাউদ, হাদীছ নং- ৪৯৪১। তিরমিযী হাদীছ নং- ১৯২৫। সিলসিলায়ে সাহীহাঃ ৯২৫।

এখানে (في) শব্দটি নির্দিষ্ট স্থান বুঝাতে ব্যবহার হয়নি। এটি আল্লাহর বাণীঃ

﴿أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ﴾

"তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন।" (সূরা মুলকঃ ১৬-১৭) এখানে (في) শব্দটি (على) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একথার পক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। যেমন পূর্বের প্রসিদ্ধ হাদীছটি। "তোমরা জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন" একথার মাধ্যমে যমিনের অভ্যন্তরে লুকায়িত কীটপতঙ্গ উদ্দেশ্য নয়; বরং যমিনের উপরে যত মানুষ ও জীব-জন্তু রয়েছে সবই উদ্দেশ্য। এটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বাণী "আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করবেন"এর মতই। অর্থাৎ যিনি আকাশের উপরে আছেন। যারা হকের দাওয়াত দেন, তাদেরকে এধরণের ব্যাখ্যা অবশ্যই জানতে হবে।

ছাগলের রাখালনীর হাদীছটির অর্থ উপরোক্ত ব্যাখ্যার খুবই কাছাকাছি, যা সকলের নিকট অতি প্রসিদ্ধ। এখানে শুধু দলীল গ্রহণের স্থানটি উল্লেখ করব। তা এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আল্লাহ কোথায়? উত্তরে সে বললঃ আকাশে।[১] আজকের দিনে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় শায়খদেরকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেনঃ আল্লাহ কোথায়? তারা

[1] - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সালাত।

বলবে সকল স্থানেই আল্লাহ বিরাজমান। অথচ সাধারণ একজন দাসী উত্তর দিল যে আল্লাহ আকাশে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করলেন। স্বীকৃতি দেয়ার কারণ হল, সে তার ফিতরাত তথা প্রকৃত স্বভাব থেকে উত্তর দিয়েছিল। সে আমাদের সালাফী সমাজের মত নির্ভেজাল পরিবেশে বসবাস করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই মাদরাসাটি বিশেষ কোন নারী-পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট ছিলনা; বরং তা সকল নারী-পুরুষ তথা সমাজের সকল মানুষের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই জন্যই ছাগলের রাখালনী সঠিক আকীদা জানতে পেরেছিল। সে অন্য কোন খারাপ পরিবেশের মাধ্যমে কলূষিত না হয়ে কুরআন-সুন্নায় বর্ণিত সঠিক আকীদা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল যা বর্তমানে কুরআন-সুন্নার জ্ঞানের দাবীদার অনেক মানুষই জানেনা। তারা জানেনা যে, তাদের প্রতিপালক কোথায় আছেন। অথচ তা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। আমি যে ব্যাখ্যা প্রদান করলাম, ছাগলের রাখাল তো দূরের কথা, যারা সমস্ত উম্মতের রাখালী করার দাবী করে তাদের কাছেও এ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবেনা। তবে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের মাঝে তা পাওয়া যেতে পারে।

সঠিক আকীদার দাওয়াতের ক্ষেত্রে অবিরাম শ্রম ব্যয় করা দরকারঃ

তাওহীদের দাওয়াত দেয়া এবং মানুষের অন্তরে উহা বদ্ধমূল করার জন্য আমাদের উচিত আমরা যেন প্রথম যুগের মানুষের মত আয়াতগুলো ব্যাখ্যা ব্যতীত শুধুমাত্র তিলাওয়াত করাই যথেষ্ঠ না মনে করি। কারণ তারা সহজেই আরবী ভাষার বাক্যসমূহ অনুধাবন করতে

সক্ষম ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তাদের মাঝে আকীদার ক্ষেত্রে কোন বিভ্রান্তি , দর্শন কিংবা যুক্তি বিদ্যার প্রভাব ছিলনা। কাজেই সঠিক আকীদার পরিপন্থী কিছুই ছিলনা। আজকের অবস্থা প্রথম যুগের মুসলমানদের অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমানকালে দাওয়াতী কাজ করা প্রথম যুগের দাওয়াতী কাজের মত সহজ নয়। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। সেসময় সহজের কারণ হল, সাহাবীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছ থেকে সরাসরি হাদীছ শুনতেন। এমনিভাবে তাবেয়ীগণ সরাসরি সাহাবীদের কাছ থেকে হাদীছ শুনতেন। একই অবস্থা বিরাজমান ছিল সম্মানিত তিন যুগে। সে যুগে ইলমুল হাদীছ নামে আলাদা কোন ইলম ছিলনা। ছিলনা ইলমুল জারহ্ ওয়াত্ তা'দীল তথা হাদীছ যাচাই বাছাই করার জন্য স্বতন্ত্র কোন ইলম। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের জন্য এদু'টি ইলম অত্যন্ত জরুরী; বরং তা ফরজে কেফায়ার পর্যায়ে। যাতে করে আলেমগণ হাদীছকে সহীহ কিংবা যঈফ হিসাবে জানতে পারেন। বর্তমানে বিষয়টি তেমন সহজ নয় যেমন সহজ ছিল সাহাবীদের যুগে। কেননা এক সাহাবী অন্য সাহাবীর নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। আর সাহাবীদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন। সেদিন যা সহজ ছিল আজকে তা সহজ নয়। কারণ সে যুগে শিক্ষা ছিল নির্ভেজাল এবং পরিচ্ছন্ন এবং উস্তাদগণ ছিলেন বিশ্বস্ত। এজন্যই আজকে আমাদের সতর্ক হতে হবে। তাছাড়া আমাদেরকে ঘিরে আছে নানা ধরণের বিপদাপদ, যা পূর্বের মুসলমানদের ছিলনা। সঠিক আকীদা থেকে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় সঠিক আকীদা সম্পর্কে নানা সন্দেহের জন্ম দেয়ায় সদা তৎপর।

এখানে আমরা একটি সহীহ হাদীছের অংশ উল্লেখ করার প্রয়োজন

অনুভব করছি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ যামানায় ইসলামের করুণ অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে বললেনঃ "তাদের একজনের জন্য পঞ্চাশ জনের ছাওয়াব রয়েছে। সাহাবীগণ বললেনঃ "আমাদের ভিতরকার পঞ্চাশ জনের? না তাদের পঞ্চাশ জনের?" উত্তরে তিনি বললেনঃ "তোমাদের ভিতরকার পঞ্চাশ জনের"।[১] এটি বর্তমানে ইসলামের দূরবস্থার ফলাফল, যা প্রথম যুগে ছিলনা। প্রথম যুগের সমস্যা ও দ্বন্দ ছিল প্রকাশ্য শির্ক এবং নির্ভেজাল তাওহীদের মধ্যে। কিন্তু বর্তমানের সমস্যা হল মুসলমানদের ভিতরেই। অধিকাংশের তাওহীদ বর্তমানে ভেজালে পরিপূর্ণ। তারা ঈমানের দাবী করে অথচ তাদের ভিতরে গাইরুল্লাহর ইবাদত রয়েছে। এ সমস্যাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা দরকার। এটা বলা কোন ক্রমেই ঠিক হবেনা যে, তাওহীদের পর্ব ছেড়ে দিয়ে আমাদেরকে অন্য একটি পর্বে যেতে হবে। আমি এটা বিশ্বাস করিনা যে, মুসলিম জাতির বিরাট একটি অংশ সঠিক ইসলামকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষা ও সংস্কারের মূল ভিত্তিঃ

আমরা সব সময় বলি যে, শিক্ষা এবং সংস্কারই হল সামাজিক পরিবর্তনের মূলভিত্তি। দু'টি বিষয় এক সাথে থাকতে হবে। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে দু'একটি দেশে বিশেষ করে সৌদি আরবে আকীদার ক্ষেত্রে সংস্কার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি একটি বিরাট কাজ। আর ইবাদতের ক্ষেত্রে কথা হল, আমাদেরকে মাযহাবী

---

[1] - তাবরানী, ইমাম আলবানী হাদীছটি সহীহ বলেছেন।

সংকীর্ণতা হতে বের হয়ে আসতে হবে এবং সহীহ সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে। কোন কোন দেশে কতিপয় আলেম যদি ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে তবে এর অর্থ এই নয় যে তারা ইসলামের ভিতরে অনুপ্রবেশকারী সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে তারা ইসলামকে পবিত্র করতে সক্ষম। চাই তা আকীদার ক্ষেত্রে হোক কিংবা ইবাদতে কিংবা আচার-ব্যবহারে। মোট কথা কতিপয় লোকের মাধ্যমে বর্তমানে সংস্কার সম্ভব নয়; বরং এর জন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তাই যে কোন সমাজে আকীদার সংশোধন ব্যতীত রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু করলে মন্দ ফলাফল বয়ে আনবে। যে দেশের শাসকগণ পরামর্শের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলন না করে, নসীহত করাই যথেষ্ঠ। এতেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে।

মানুষকে উপকারী বিষয় যেমন, আকীদার সংশোধন, ইবাদত, উত্তম চরিত্র এবং ব্যবহারসমূহ শিক্ষা দেয়াও নসীহতের অন্তর্ভূক্ত।

কেউ কেউ ধারণা করতে পারে যে, আমরা একসাথে সমস্ত ইসলামী সমাজের সংস্কার করেত চাই। এ ধরণের চিন্তা আমরা কখনও করিনা। কারণ এটা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাযীদে বলেনঃ

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾

"আর আপনার প্রভু যদি চাইতেন, তবে সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র জাতিতে পরিণত করে দিতেন। তারা সদা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে"। (সূরা হুদঃ ১১৮) এদের ব্যাপারে আল্লাহর বাণী বাস্তবায়িত হবেনা

যতক্ষণ না তারা সঠিক ইসলামকে বুঝবে এবং নিজেদেরকে, পরিবারকে এবং পার্শ্ববর্তী সকলকে সঠিক ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করবে।

কে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং কখন?

বর্তমানে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়াতে অনেক সমস্যা রয়েছে। তবে আমরা রাজনীতিতে জড়িত হওয়া অস্বীকার করিনা; বরং একই সময়ে সবগুলোতে অংশ গ্রহণ করাতে বিশ্বাস করি। প্রথমে আকীদা সংশোধনের মাধ্যমে শুরু করব তারপর ইবাদত অতঃপর আচার-ব্যবহার। পরবর্তীতে শরীয়ত সমর্থিত রাজনীতে যোগদান করব। কেননা রাজনীতির অর্থই হল জাতির সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করা। প্রশ্ন হল কে পরিচালনা করবে? যায়েদ? বকর? আমর না অন্যান্য পার্টি বা আন্দোলনের আমীরগণ? কখনই নয়। এটি মুসলমানদের বায়আতের মাধ্যমে নির্বাচিত মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের কাজ। কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের উপর রাজনীতি জানা এবং পরিচালনা করা ওয়াজিব। মুসলমানেরা যেহেতু বর্তমানে আঞ্চলিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাই প্রত্যেক অঞ্চলের দায়িত্বশীল সে অঞ্চলের কাজ-কর্ম পরিচালনা করতে পারে।

আমরা যদি প্রত্যেকেই রাজনীতি শুরু করি এই ভেবে যে, আমরা তা ভাল বুঝি তথাপিও এটা আমাদের কোন উপকারে আসবেনা। কেননা আমরা তা পরিচালনা করতে অক্ষম। আর আমরা সিদ্বান্ত গ্রহণ এবং তা কার্যকর করার মালিকও নই। কাজেই এ সমস্ত কাজে লিপ্ত হওয়ার অর্থই উপকারহীন কাজে লিপ্ত হওয়া। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, অনেক ইসলামী দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুদ্ধ চলছে, সে ব্যাপারে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করাতে

কোন লাভ নেই। কারণ শরীয়ত সম্মত দায়িত্বশীল এমন কোন ইমাম নেই, যার হাতে বায়আত করা হয়েছে। কাজেই উৎসাহিত করাতে কোন লাভ নেই। উৎসাহিত করা যে ওয়াজিব নয় তা বলছিনা; বরং বলছি যে, এখনও বলার সময় হয়নি। এ জন্যই আমাদের কর্তব্য হল নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকে ইসলাম বুঝানোর কাজে ব্যস্ত রাখব। আবেগ প্রবন হয়ে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করার কারণে সঠিক ইসলামের শিক্ষা অর্জন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়ার ভয় রয়েছে। অথচ ইসলামী আকীদা, ইবাদত ও আচরণ শিক্ষা করা সকলের উপর ফরজে আঈন। এতে ত্রুটি করা কারও পক্ষ হতে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয় ফরজে কেফায়ার অন্তর্গত। যেমন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া, যা নেতৃস্থানীয় এবং জ্ঞানীদের দায়িত্ব। তারা ভালভাবে রাজনৈতিক বিষয়গুলো শিক্ষা করে তা বাস্তবে রূপদান করবে। যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই তাদের জন্য এটা শিক্ষা করা জরুরী নয়। তাদের উচিৎ মানুষকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা দান করা। তারা যদি রাজনৈতিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তারা দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন এবং তা শিক্ষা দেয়া থেকে বঞ্চিত হবে। বর্তমানে অনেক ইসলামী দলের কর্মপদ্ধতিতে আমরা এটাই লক্ষ করছি। তাতে যুবকদেরকে আকীদা, ইবাদত এবং উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এমনকি দলের নেতাগণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে যে কোনভাবে মানব রচিত পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার চেষ্টা করে। আর এটিই তাদেরকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ধাবিত করেছে।

সর্বশেষ প্রশ্নে বলা হয়েছে যে, বর্তমান দুঃখ জনক প্রেক্ষাপটে একজন মুসলিম কিভাবে দায়িত্ব পালন করে কিয়ামতের দিন জিম্মাদারী হতে রেহাই পেতে পারে?

উত্তরে বলব যে, প্রত্যেক মুসলিম আপন আপন সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবে। আলেমের উপর এমন বিষয় ওয়াজিব, যা সাধারণ লোকের উপর ওয়াজিব নয়। এ প্রসঙ্গে আমরা বলব যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের মাধ্যমে দ্বীনকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং তাঁর কিতাবকে মুমিনদের জন্য সংবিধান হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর"। (সূরা আম্বীয়াঃ ৭) আল্লাহ তা'আলা ইসলামী সমাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। আলেম সমাজ এবং সাধারণ সমাজ। আর আলেমের উপর যা আবশ্যক, সাধারণ মানুসের উপর তা আবশ্যক নয়। সুতরাং যারা আলেম নয়, তাদের উচিৎ আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করা। আলেমদের উপর আবশ্যক হল, তাদেরকে যেবিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, তার উত্তর দিবে। কাজেই ব্যক্তি অনুপাতে দায়িত্ব বিভিন্ন রকম হবে। আলেমদের উচিৎ, তাদের সামর্থ অনুযায়ী সত্যের দিকে আহবান জানাবো। সাধারণ লোকদের উচিৎ তারা তাদের নিজেদের এবং অধিনস্ত স্ত্রী-সন্তানদের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় জিজ্ঞাসা করা। উভয় শ্রেণীর লোকেরা তাদের দায়িত্ব পালন করলে তারা পরিত্রাণ পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ কাউকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না"। (সূরা বাকারাঃ ২৮৬)

পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলমানেরা বর্তমানে এমন বিপর্যয়ের ভিতরে রয়েছে, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। পৃথিবীর সমস্ত কাফের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

﴿تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّـةٍ نَحْـنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِـنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَـا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ﴾

"তোমাদের উপর পৃথিবীর সমস্ত জাতি ঝাঁপিয়ে পড়বে যেভাবে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা খাদ্যের বাসনকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে। সাহাবীগণ বললেনঃ আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সেদিন এরকম হবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ না তোমাদের সংখ্যা সেদিন অনেক হবে। কিন্তু তোমরা সেদিন বন্যায় বাসমান তৃণলতার মত দুর্বল হবে। তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে ভয় ছিনিয়ে নেয়া হবে। তোমাদের অন্তরে ওয়াহান ঢেলে দেয়া হবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ওয়াহান কাকে বলে? উত্তরে তিনি বললেনঃ দুনিয়ার ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। [১]

সুতরাং আলেমদের উচিৎ মুসলমানদেরকে সংশোধন করা। আর তা সঠিক তাওহীদ এবং বিশুদ্ধ ইবাদত ও চরিত্র শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমেই

[1] - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মালাহিম।

সম্ভব। প্রত্যেকেই আপন আপন সামর্থ অনুযায়ী নিজ নিজ দেশে কাজ করবে। সঠিক আকীদা এবং বিশুদ্ধ ইবাদত ও চরিত্র শিক্ষা দানের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ এই যে, তারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অক্ষম। কারণ তাঁরা ঐক্যবদ্ধ নয়। তারা এক দেশ বা একই কাতারে সমবেত নয়। তাই শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্তমানে এধরণের জিহাদে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তবে তাদের উচিৎ শরীয়ত সম্মত সকল প্রকার উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা। যদিও আমাদের শক্তি থাকে তথাপিও আমরা কিছু করতে সক্ষম নই। কারণ অনেক ইসলামী দেশের সরকার ইসলামী আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র চালায়না। সুতরাং যেহেতু আমরা জিহাদ করতে সক্ষম নই তাই আমাদের উচিৎ আমরা আকীদা ও চরিত্র সংশোধনের কাজে লিপ্ত থাকব। সুতরাং যে দেশে ইসলামী শাসন নেই সে দেশের আলেম ও দাঈগণ যদি উপরোক্ত দু'টি কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে তাদের উপরে আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾

“এবং মুমিনগণ সে দিন আল্লাহর সাহায্যে আনন্দিত হবে”। (সূরা রোমঃ ৪- ৫)

প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ তার ব্যক্তিগত জীবণে ইসলাম বাস্তবায়ন করাঃ

প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হল সাধ্যানুযায়ী কাজ করা। আল্লাহ কারো উপর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেন নি। তাওহীদ ও সঠিক ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা এবং যে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন নেই, সেখানে ইসলামী হুকূমত প্রতিষ্ঠা করা একটি অপরটির জন্য জরুরী নয়। কেননা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করাই হল আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে ফয়সালা করার প্রথম পর্যায়। কোন কোন যুগে এমন কিছু

ঘটনা ঘটেছে, যেখানে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে না জড়িয়ে তা থেকে দূরে থাকাই উত্তম ছিল। এ সকল পরিস্থিতিতে একজন মুসলিম ব্যক্তি জনসমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হবে এবং মানুষের অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকবে। এমর্মে অনেক হাদীছ রয়েছে। ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেনঃ

الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ ।

"যে মুসলিম ব্যক্তি মানুষের সাথে মেলা-মেশা করে এবং তাদের পক্ষ হতে প্রাপ্ত কষ্ট সহ্য করে সে ঐ মুসলিম হতে ভাল যে মানুষের সাথে মেলা-মেশা করেনা এবং তাদের থেকে আগত কষ্টও সহ্য করেনা"।[১] পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাওহীদ প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম মাত্র। তা মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিছু কিছু আলেম এমন বিষয় বাস্তবায়নের চেষ্টা করে এবং সহজ বলে মনে করে, যা তাদের ক্ষমতায় নেই। এ বিষয়ে তারা শ্রমও ব্যয় করে থাকে। এ ব্যাপারে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তার অনুসারীদেরকে বলেছেন, "তোমাদের নিজেদের ভিতরে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম কর, তাহলেই তোমাদের যমিনে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে। তারপরও আমরা উক্ত ব্যক্তির অনেক অনুসারীকেই তার কথার বিরোধিতা করতে দেখি। তারা সব সময় জোর দিয়ে বলে থাকে হুকুমের মালিক একমাত্র আল্লাহ। কোন সন্দে নেই যে, হুকুমের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাতে কোন শরীক নেই। কিন্তু তাদের

---

[1] - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সিফাতুল কিয়ামাহ।

প্রতেকেই কোন না কোন মাযহাবের অনুস্মরণ করে থাকে। যখন তাদের কাছে সহীহ হাদীছ পৌঁছে তখন বলেঃ এটি আমার মাযহাবের পরিপন্থী। কোথায় গেল সুন্নাতের ক্ষেত্রে আল্লাহর অবতারিত বিষয় দিয়ে ফয়সালা? তাদের কেউ কেউ আবার সূফী তরীকায় আল্লাহর ইবাদত করে থাকে। কোথায় গেল তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর অবতারিত বিষয় দিয়ে ফয়সালা করা? তাদের নিজেদের ভিতরে যে জিনিষ নেই তা তারা অন্যের নিকট দাবী করে থাকে। তোমার আকীদাহ, ইবাদত, চরিত্র, ঘর, সন্তান-সন্ততি এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর অবতারিত বিষয় বাস্তবায়ন করা খুবই সহজ। অথচ যে শাসক অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন দিয়ে বিচার করেনা তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো অত্যন্ত কঠিন। তবে কেন তুমি সহজটি ছেড়ে দিয়ে কঠিনের দিকে যাচ্ছ?

তাদের এ পথে যাওয়ার পিছনে দু'টি কারণের একটি কারণ রয়েছে। হয়ত তারা সঠিক শিক্ষা ও দিক নির্দেশনা পায়নি অথবা তাদের আকীদাহ ভাল নয়। ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা এবং মন্দ আকীদাহ তাদেরকে সম্ভব বিষয়কে বাদ দিয়ে অসম্ভব বিষয় বাস্তবায়নের দিকে ধাবিত করছে। আজকের প্রেক্ষাপটে সঠিক শিক্ষা, মানুষকে সঠিক আকীদা এবং ইবাদতের দিকে আহবান করা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিৎ মনে করিনা। প্রত্যেকেই সামর্থ অনুযায়ী এ কাজে আঞ্জাম দিয়ে যাবে। আল্লাহ সাধ্যাতীত দায়িত্ব কাউকে চাপিয়ে দেননি। আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী এবং নবী পরিবারের সকলের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমীন॥